দশম অধ্যায়
স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে নাগরিক চেতনা

পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আমরা সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্র, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য এবং নাগরিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এ দেশের নাগরিকদের ভূমিকা ইতিহাস থেকে জানব।

এ অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে আমরা–

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ এবং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দেশপ্রেমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি করতে পারব।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি

আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার আগে আমরা ছিলাম পাকিস্তানের নাগরিক। জনসংখ্যায় দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৬ শতাংশ) হওয়া সত্ত্বেও সে সময়ে পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) মানুষ নাগরিক হিসেবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কারণে এখন বাঙালিরা স্বাধীনভাবে তাদের নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারছে।

পাকিস্তানি শাসনের (১৯৪৭-১৯৭১) আগে বাংলাদেশের এই অঞ্চল তুর্কি, আফগান, মুঘল এবং পরিশেষে ব্রিটিশ শাসনের (১৭৫৭-১৯৪৭) অধীন ছিল।

ব্রিটিশ শাসন আমলে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একশ্রেণির নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। এই নেতৃত্ব রাজনীতি, সংগঠন, সমাজ-সংস্কার, চাকরি, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিকাশলাভ করে। ব্রিটিশ শাসনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ১৮৬১ সাল থেকে শুরু করে গৃহীত বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার। এর পথ ধরে পর্যায়ক্রমে জনগণ ভোটের অধিকার লাভ করে। এসবই ছিল ঐ সময়ে নাগরিক অধিকার ও সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব

ব্রিটিশ শাসন আমলে অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও স্বশাসনের চেতনা জাগ্রত হয়। আর এ ক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে ঘোষণা করেন। যার ফলে পরবর্তীকালে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে আলাদা আবাসভূমির চিন্তা জাগ্রত হয়।

এই চিন্তাধারার আলোকেই ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থ-সম্বলিত একটি প্রস্তাব পেশ

করেন। জিন্নাহর সভাপতিত্বে সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' বা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত।

লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য বা বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ–

১. ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য করতে হবে।

২. এসব অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. এ সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত।

৪. ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে।

৫. দেশের যেকোনো ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' কথাটি ছিল না, যদিও এ প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিতি লাভ করে। লাহোর প্রস্তাবে কার্যত ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দু'টি অঞ্চলে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করা হয়। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায়ও তা-ই হওয়ার কথা।

১৯৪৬ সালে জিন্নাহর নেতৃত্বে 'দিল্লি মুসলীম লেজিসলেটরস কনভেনশন'-এ মুসলমানদের একাধিক রাষ্ট্র-পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে এক পাকিস্তান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সে অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। ভারত উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান ও বাকি অংশ নিয়ে ভারত ইউনিয়ন।

১৯৪০ সালের 'লাহোর প্রস্তাব' ও জিন্নাহর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' পাকিস্তান সৃষ্টির মূলভিত্তি ছিল। এর উপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হলেও এর কাঠামোগত চরিত্রে মিল ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই অংশ এক হাজারের অধিক মাইল ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা বিভক্ত ছিল। রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ভাষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। পশ্চিম পাকিস্তানি বিশেষ করে পাঞ্জাবিরা মনে করত, তাদের পূর্ব পুরুষেরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আগত এবং তাদের ধমনিতে রয়েছে অভিজাতের রক্ত। এই ধরনের মানসিকতার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালি মুসলমানদের নিচু জাতের মানুষ হিসেবে দেখত।

বস্তুত পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এক ধরনের অভ্যন্তরীণ বৈষম্যমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই শাসনকালে বাঙালিদের অবস্থা ছিল অনেকটা নিজ দেশে পরবাসীর মতো। পূর্ব বাংলার বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ভাষা বাংলার পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের ভাষা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল।

ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২)

মাতৃভাষার অধিকার গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার। পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা ছিল বাংলা; উর্দু কোনো অঞ্চলেরই মাতৃভাষা ছিল না। অথচ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। অগণতান্ত্রিকভাবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙালিদের যে আন্দোলন শুরু হয়, তা-ই ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র নেতৃত্বের সমন্বয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তাদের দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা। যে কারণে আমরা দেখি, ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে পরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবি প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেন। কিন্তু শুরু থেকেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত ছিল না।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ছাত্ররা বাংলা ভাষা দাবি দিবস পালন করে। ঐ দিন সাধারণ ধর্মঘট পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম ছাত্রলীগের (প্রতিষ্ঠা ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৪৮) নেতৃবৃন্দ এ আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল। ১১ মার্চ সকালে সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে পিকেটিংরত অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদসহ অনেকে গ্রেপ্তার হন।

ভাষা আন্দোলনের এ পর্বে ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকায় প্রথম সফরে এসে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' ঐ ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ হয়। প্রতিবাদকারীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অন্যতম। আন্দোলনের সূচনা ও তা সংগঠিত করতে তিনি কার্যত নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। যে কারণে তাঁকে একাধিকবার গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়। জিন্নাহর ঢাকা সফরে আসার পূর্বে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি ৮-দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ ভাষাসংক্রান্ত তার পূর্ব ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন। সেখানেও প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে ছাত্রসমাজের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি সম্পূর্ণ ভঙ্গ করে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা দেন। তার এ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত পর্ব। কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এর পূর্বে আব্দুল মতিনকে আহবায়ক করে গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি। খাজা নাজিমুদ্দীন কর্তৃক উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' এবং রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে বন্দী অবস্থায় ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন, যা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সমাবেশ পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

সরকার কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারির আগের দিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ছাত্ররা একুশে ফেব্রুয়ারির দিন ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে সমাবেশ অনুষ্ঠান ও মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে শহীদ হন সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে তা স্বীকৃত হয়। বাঙালিরাই পৃথিবীতে একমাত্র জাতি, যারা ভাষার দাবিতে জীবন দিয়েছে। ইউনেস্কোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতিসংঘ (১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯) ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমানে আমাদের শহীদ দিবস 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে বিশ্বের সর্বত্র উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বঙ্গবন্ধু ও মওলানা ভাসানীর প্রভাতফেরি

ধর্মভিত্তিক জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভাষা আন্দোলনে আত্মদানের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে ভাষার ভিত্তিতে বাঙালিরা এক জাতিসত্তার পরিচয়ে পরিচিত হয়। অতএব, ভাষা আন্দোলন বাংলার মানুষের নিজেদের অধিকারের চেতনার জায়গাটি তৈরি করে। এতে জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আরও বেগবান হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগসহ সমমনা কতিপয় দল নিয়ে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি নির্বাচনি জোট গঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ব বাংলার নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনাকে আরো বৃদ্ধি করে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে যুক্তফ্রন্ট সর্বস্তরের ভোটারদের আকৃষ্ট করতে ২১ দফাবিশিষ্ট একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে, যেখানে বাঙালি নাগরিকদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিকগুলো তুলে ধরা হয়। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান, ভাষাশহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ, পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ২১ দফা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব দাবি ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে। অন্যদিকে, পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন পায়।

১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভের পর শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যুক্তফ্রন্টের হাতে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। মাত্র ৫৬ দিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা হয় এবং পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম করা হয়।

স্বাধীনতার দীর্ঘ ৯ বছর পর ১৯৫৬ সালে সর্বপ্রথম পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন সম্ভব হয়। এতে বাঙালিদের কতিপয় দাবি বিশেষ করে বাংলাকে রাষ্ট্রের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে বেশি দিন ঐ সংবিধান কার্যকর হয়নি। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জা কর্তৃক তা বাতিল ঘোষিত হয়। তিনি সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন। এর তিন সপ্তাহের মধ্যে ইস্কান্দর মীর্জাকে সরিয়ে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। তিনি সর্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিক পশ্চিমা গণতন্ত্রের ধারণা প্রত্যাখ্যান করে 'মৌলিক গণতন্ত্রের' ধারণা প্রবর্তন করেন।

১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান তার 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ' ঘোষণা করেন। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থাধীনে পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) করে মোট ৮০,০০০ (আশি হাজার) ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নিয়ে দেশের নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। এদের দ্বারা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ নির্বাচনের বিধান করা হয়। এই পদ্ধতিতে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি সৃষ্টি করে নাগরিকদেরকে প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে পরোক্ষ নির্বাচনপদ্ধতির কারণে পূর্ববাংলা জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ হারায়। উপরন্তু, আইয়ুব সরকার কালো আইন জারি করে জনপ্রিয় রাজনীতিকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখেন। আইয়ুব শাসন আমলেই বাঙালিদের মধ্যে বেশি করে আলাদা জাতিগত পরিচয়ের প্রকাশ ঘটে।

১৯৬২ সালে জেনারেল আইয়ুব খান নিজস্ব ধ্যান-ধারণানির্ভর একটি নতুন শাসনতন্ত্র দেন। তাতে সংসদীয় সরকার এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ধারা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্রপতিকে এই ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে অসীম ক্ষমতাধর এক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করার পর থেকে ১৯৬২ সালের জুন পর্যন্ত জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক শাসন বহাল থাকে। তিনি একটানা ৪৪ মাস সামরিক আইন দ্বারা দেশ পরিচালনা করেন। রাজনৈতিক দল ও এর তৎপরতা, সকল সভা-সমাবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ মোট ৭৮ জন রাজনীতিককে কালো আইনের আওতায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোনোরূপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখেন।

১৯৬২ সালে 'শরীফ শিক্ষা কমিশন' রিপোর্টে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি পাঠ বাধ্যতামূলক, উর্দুকে জনগণের ভাষায় পরিণত করা এবং একই সাথে জাতীয় ভাষার জন্য একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তনের চেষ্টা এবং সেক্ষেত্রে আরবির গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা, রোমান বর্ণমালার সাহায্যে পাকিস্তানি ভাষাসমূহকে লেখা, শিক্ষা খরচ শিক্ষার্থীদের বহন করা, ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছর মেয়াদি করা ইত্যাদি সুপারিশ করা হয়। ছাত্ররা এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনে নামে।

আইয়ুবের সামরিক শাসন চলাকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে। তখন কোনো কোনো সংবাদপত্র বিশেষ করে দৈনিক ইত্তেফাক সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে অবতীর্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে এসব পত্রিকার কণ্ঠরোধ করতে পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর ১৯৬২ ও ১৯৬৬ সালেও দুইবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পাকিস্তানের শুরুতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুই অংশের মধ্যে পূর্ব বাংলার অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত ভালো। কিন্তু এই অবস্থা বেশি দিন টিকে থাকেনি। ক্রমান্বয়ে দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি এবং ব্যবধানের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পাকিস্তানের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জেনারেল আইয়ুব বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতি আঞ্চলিক বৈষম্যের পরিমাণ না কমিয়ে বরং তা আরো বাড়িয়ে দেয়। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান প্লানিং কমিশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক তথ্য প্রকাশ করেন যে দেশের শতকরা ৬৬ ভাগ শিল্প, ৭৯ ভাগ বীমা এবং ৮০ ভাগ ব্যাংক সম্পদ মাত্র ২২টি পরিবারের হাতে (যার মধ্যে ১টি বাদে বাকি সব পশ্চিম পাকিস্তানি) কেন্দ্রীভূত। জেনারেল আইয়ুব খানের এক দশকের শাসন আমলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়। এর সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হয়। পাকিস্তানের পূর্ব অংশের পুঁজি পশ্চিম অংশে পাচার হয়ে যায়।

৬ দফা কর্মসূচি

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনভেনশনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। ৬ দফা কর্মসূচি ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

দফা-১ : লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্যসহ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দফা-২ : বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা ছাড়া সকল বিষয় স্টেট বা প্রদেশের হাতে ন্যস্ত থাকবে। উল্লিখিত দু'টি বিষয় ন্যস্ত থাকবে কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে।

দফা-৩ : পাকিস্তানের দু'টি অঞ্চলের জন্য পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। অথবা সমগ্র দেশে একটি মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, তবে সে ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার রোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য একটি ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে কার্যকরী ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দফা-৪ : অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশগুলোর কর বা শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে। তবে ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর একটি অংশ পাবে।

দফা-৫ : পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পৃথক হিসাব রাখা হবে। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্ব স্ব অঞ্চলের বা অঙ্গরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

দফা-৬ : নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ প্যারামিলিশিয়া বা আধাসামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে পারবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত ৬ দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তির সনদ বা 'ম্যাগনাকার্টা'। কার্যত এই ৬ দফার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি ধাচের বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে বাঙালির জাতীয়-মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য স্থির হয়। জেনারেল আইয়ুব খান ৬ দফাকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী,' 'বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার' কর্মসূচি হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং তা নস্যাৎ করতে যেকোনো ধরনের শক্তি প্রয়োগের হুমকি দেন।

৬ দফার সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামী করে ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক একটি মামলা দায়ের করে, যা ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা নামে পরিচিত। এর আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। এই মামলার আওতায় বঙ্গবন্ধু ও ৬ দফাপন্থী অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে দীর্ঘ সময় বন্দী অবস্থায় কারা অভ্যন্তরে কাটাতে হয়। ফলে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্বভার সচেতন ছাত্রসমাজের উপর গিয়ে বর্তায়। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন ও মতিয়া উভয় গ্রুপ), সরকারি ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের দোলন গ্রুপ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইয়ুববিরোধী মঞ্চ, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ডাকসুর তৎকালীন সহ-সভাপতি অনলবর্ষী ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ এর সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ৬ দফা কর্মসূচির প্রতি সর্বাত্মক সমর্থনসহ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ জাতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে ১১ দফা ভিত্তিক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচি পূর্ব বাংলার মানুষের জাতীয় মুক্তির বা স্বাধীনতার লক্ষ্যকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। বস্তুত ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত পাঁচ মাস সমগ্র পূর্ব বাংলায় গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। একই সময় পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব-বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠে।

৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে একটি সুদৃঢ় নাগরিক ঐক্য গড়ে উঠার ভিত্তি তৈরি হয়। আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ছাত্র আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। সংঘটিত হয়

৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান। গণ-অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। আগরতলা মামলাবিরোধী গণ-অভ্যুত্থান স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান

মৌলিক গণতন্ত্র, আগরতলা মামলা ও আইয়ুব শাহীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় অংশে ১৯৬৯ সালে এক দুর্বার গণ-আন্দোলন শুরু হয়। ছাত্রসমাজের ১১ দফা কর্মসূচিতে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, বাক-স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ, কৃষক-শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি, জরুরি নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তি প্রভৃতি দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সকল বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হয়। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়। এ হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশে শুরু হয় গণ-আন্দোলন। বিরোধী দলগুলো গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (DAC) গঠন করে। শুরু হয় দেশব্যাপী তীব্র ছাত্র গণ-আন্দোলন।

আইয়ুব খানের পদত্যাগ, ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল, 'এক ব্যক্তি এক ভোটের' ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে দেশব্যাপী গড়ে ওঠা আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেন। বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের পর ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল ছাত্র-জনতার সভায় বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

ক্ষমতাসীন হয়ে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান উদ্ভুত রাজনৈতিক সংকট সমাধানে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের উপর বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেন। পাকিস্তানে প্রথম সাধারাণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তিনি কতিপয় শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ ঘোষণা করেন। এর মধ্যে এক ব্যক্তি, এক ভোট, প্রত্যেক প্রদেশের জন্য জাতীয় পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসনসংখ্যা বণ্টননীতি ছিল অন্যতম। জাতীয় পরিষদের আসনসংখ্যা হবে ৩১৩, যার মধ্যে ১৩টি হবে সংরক্ষিত মহিলা আসন। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান রাখা হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের জন্য সর্বোচ্চ ১২০ দিন ধার্য করা হয়। প্রণীত সংবিধান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যকীয় করা হয়।

১৯৭০-এর নির্বাচন ও ফলাফল

১৯৭০ সালের নির্বাচনই ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। প্রাপ্তবয়স্ক এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন দু'দফায় যথাক্রমে ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ এবং ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলগুলো হচ্ছে- আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ওয়ালী খান), মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ, জামায়াত-ই-ইসলামী, জমিয়তে উলামা-ই-ইসলাম, জমিয়তে উলামা-ই-পাকিস্তান, নিজাম-ই-ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রধান দু'টি দল হচ্ছে, পূর্ব বাংলায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইস্যু ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফা। অপরদিকে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির নির্বাচনি স্লোগান ছিল- 'ইসলাম আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি।' পিপলস পার্টির প্রচারণার মূল বিষয়বস্তু ছিল- 'শক্তিশালী কেন্দ্র', 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' এবং অব্যাহত ভারত বিরোধিতা।

অন্যদিকে মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ইসলামপন্থী দল বা গ্রুপ তাদের নির্বাচনি প্রচারে পাকিস্তান পিপলস পার্টির মতো ইসলামী সংবিধান, শক্তিশালী কেন্দ্র এবং ভারত বিরোধিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

নির্বাচনি ফলাফল

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল নিচের সারণিতে উপস্থাপিত হলো।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের (জাতীয় পরিষদ) দলভিত্তিক ফলাফল

রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ আসন		সংরক্ষিত মহিলা আসন	উপজাতীয় এলাকার আসন	প্রাপ্ত মোট আসন সংখ্যা
	পূর্ব পকিস্তান	পশ্চিম পকিস্তান			
আওয়ামী লীগ	১৬০	-	৭	-	১৬৭
পিপলস্ পার্টি	-	৮৩	৫	-	৮৮
মুসলীম লীগ (কাইয়ুম)	-	৯	-	-	৯
মুসলীমস লীগ (কাউন্সিল)	-	৭	-	-	৭
ন্যাপ (ওয়ালী)	-	৬	১	-	৭
মুসলীম লীগ (কনভেনশন)	-	২	-	-	২
জামাত-ই-ইসলামী	-	৪	-	-	৪
জমিয়তে উলামা-ই-পাকিস্তান	-	৭	-	-	৭
জমিয়তে উলামা-ই-ইসলাম	-	৭	-	-	৭
পি.ডি.পি.	১	-	-	-	১
স্বতন্ত্র নির্দলীয়	১	৬	-	৭	১৪
সর্বমোট	১৬২	১৩১	১৩	৭	৩১৩

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনি ফলাফল

রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ আসন	মহিলা আসন	মোট আসন
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পি.ডি.পি	২	-	২
ন্যাপ (ওয়ালী)	১	-	১
জামাত-ই-ইসলামী	১	-	১
নেজামে ইসলাম	১	-	১
স্বতন্ত্র নির্দলীয়	৭	-	৭
সর্বমোট	৩০০	১০	৩১০

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় জাতীয় পরিষদের ১৬২টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব বাংলার জন্য সংরক্ষিত ৭টি মহিলা আসনসহ সর্বমোট ৩১৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭টি। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের মোট ৩০০টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি লাভ করে। অন্য ১২টি আসনের ৯টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী, ২টিতে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং একটিতে জামায়াত-ই-ইসলামী জয়লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১০টি আসনসহ আওয়ামী লীগের দলীয় আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৮টি।

অপরদিকে, জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৩৮টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে ৮৩টি আসনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি জয়লাভ করে। বাকি ৫৫টি আসনের ৯টিতে মুসলিম লীগ (কাইউম খান), ৭টিতে মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), ৭টিতে জমিয়তে উলামায়-ই-ইসলাম, ৬টিতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ওয়ালী খান), ৭টিতে জমিয়তে উলামায়-ই-ইসলাম, ৪টিতে জামায়াত-ই-ইসলামী, ২টিতে মুসলিম লীগ (কনভেনশন) এবং ১৩টিতে নির্দলীয় প্রার্থীগণ জয়লাভ করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সংরক্ষিত ৬টি মহিলা আসনের ৫টিতে পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং ১টিতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ওয়ালী খান) জয়লাভ করে। মহিলা আসনসহ পাকিস্তান পিপলস পার্টির মোট আসনসংখ্যা দাঁড়ায় ৮৮টি।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা হারানোর ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অর্জন এবং ৬ দফা ভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি নিশ্চিত হয়, যার কোনোটিই পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক আমলা শাসকগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ফলে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের অব্যবহিত পরে শুরু হয় নতুন প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। সামরিক-বেসামরিক আমলা শাসকগোষ্ঠীর এ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন।

পাকিস্তানি সামরিক জান্তা একদিকে সংকট নিরসনের নামে ঢাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্র আনা হচ্ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির বিজয়কে তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। ৬ দফা প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর অনড়-অনমনীয় অবস্থান তাদের বিচলিত করে। তাই তারা উদ্ভূত সংকটের সামরিক সমাধানে মনস্থির করে প্রস্তুতির জন্য ২৫ মার্চ পর্যন্ত সময় নেয়।

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি পাকিস্তানের 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' হিসেবেও আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু এসবই ছিল লোক দেখানো। ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র চলছিল কীভাবে নির্বাচনের রায় বানচাল করা যায়।

অসহযোগ আন্দোলন

১ মার্চ ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় হরতালের ডাক দেন। কার্যত ১ মার্চ থেকেই পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ২ মার্চ রাতে কার্ফু জারি করা হয়। ছাত্রজনতা কার্ফু ভঙ্গ করে। সেনাবাহিনী গুলি চালায়। প্রতিদিন শতশত লোক হতাহত হয়। প্রতিবাদে-প্রতিরোধে জেগে

উঠে বাংলাদেশ। উত্থান ঘটে বাঙালি জাতির। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ জাতির জনক। 'জয় বাংলা' এ জাতির মুক্তির ধ্বনি। চারিদিকে বিদ্রোহ আর গগনবিদারী স্লোগান : 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'।

১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র-জনতার সমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, ৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে ছাত্রসমাজের 'স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ', 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন', ২৩ মার্চ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে পূর্ব বাংলার সর্বত্র পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন বাঙালির জাতীয় উত্থানের স্বাক্ষর বহন করে।

১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সারা বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ পালিত হয়। পূর্ব বাংলার সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস, সেক্রেটারিয়েট, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, হাইকোর্ট, পুলিশ প্রশাসন, ব্যাংক-বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদি পাকিস্তান সরকারের নির্দেশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে পরিচালিত হয়।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। এদিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি ঘোষণা দেন–

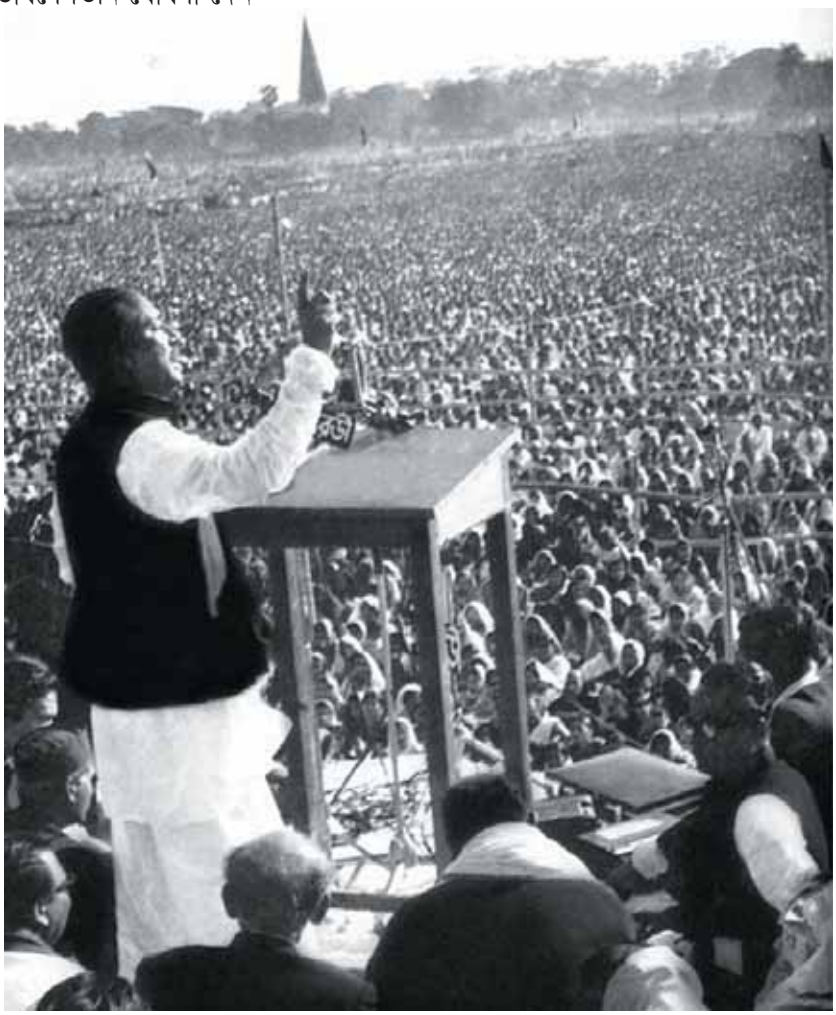

চিত্র: বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, রেসকোর্স ময়দান, ঢাকা

'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল্লাহ। ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আলোচনায় বসার অনুরোধ জানান। ১৬ মার্চ থেকে আলোচনা শুরু হয়। পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন নেতা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করা এবং পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও রসদ আমদানি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া। ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে' বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পাকিস্তানের পতাকার স্থলে স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সংকট সমাধানের লক্ষ্যে শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান কোনো রকম ঘোষণা না দিয়েই সদলবলে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ঐ রাতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। তারা ঢাকাসহ অন্যান্য শহরেও হাজার হাজার নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই রাতকে ইতিহাসে কালরাত্রি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

রায়ের বাজার বধ্যভূমি (যেখানে বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করা হয়)

২৫ মার্চের এই কালরাত্রিতেই অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ওয়্যারলেসযোগে তা পাঠিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাবাণী শোনামাত্রই চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বাঙালি, আনসার ও সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। আনুমানিক রাত ১টা ৩০ মিনিটে (মধ্যরাতে) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়।

স্বাধীনতার ঘোষণা

রাত ১টা ৩০ মিনিটে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে, যাতে বিশ্ববাসী ঘোষণাটি বুঝতে পারেন। স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদ : 'ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার

বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও" (বাংলাদেশ গেজেট, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী, ৩ জুলাই ২০১১)। স্বাধীনতার এ ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে তদানিন্তন ইপিআর এর ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে একবার এবং সন্ধ্যায় কালুরঘাট বেতার বেন্দ্র থেকে দ্বিতীয়বার প্রচার করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং এর প্রতি বাঙালি সামরিক, আধা সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর সমর্থন ও অংশগ্রহণের খবরে স্বাধীনতাকামী জনগণ উজ্জীবিত হয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভ

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে (মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে) আওয়ামী লীগের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আদেশনামা জারি করেন এবং একটি সরকার গঠন করেন যা মুজিব নগর সরকার নামে পরিচিত হয়। ১৭ এপ্রিল নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের সরকার শপথ গ্রহণ করে। মুজিব নগর সরকার গঠিত হবার পর দেশের জনগণ দলে দলে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে থাকে।

অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ও গেরিলা আক্রমণ

২৫ শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনী অগ্নিসংযোগ ও অবিরাম গোলাবর্ষণ করে ঢাকা শহরে আক্রমণ শুরু করে। রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত নাগরিকদের হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (বর্তমানে জহুরুল হক হল), সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, জগন্নাথ হল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাসগৃহে হামলা করে অনেককে হত্যা করা হয়। ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনী বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়। তাদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু বাঙালি ছাত্র, যুবক ও তরুণরা গোপনে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশের ভিতরে থেকে গেরিলা পদ্ধতিতে এবং সম্মুখযুদ্ধে পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে শুরু করে। দেশের মানুষ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় দিয়ে সহযোগিতা করে। ফলে পাকবাহিনী ক্রমে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা

মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন চলছিল অপরিকল্পিত ও অবিন্যস্তভাবে। মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিতভাবে পরিচালিত হতে থাকে।

তৎকালীন ইপিআরের বাঙালি সদস্য এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈনিক ও অফিসারদের সমন্বয়ে নিয়মিত সেনা ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়। নিয়মিত সেনা ব্যাটালিয়ন নিয়ে পরে কে-ফোর্স, এস-ফোর্স ও জেড-ফোর্স নামে তিনটি ব্রিগেড গঠিত হয়। সেনাসদস্য ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজ নামে পরিচিতি লাভ করে। কখনো এরা গেরিলা নামেও পরিচয় লাভ করে। এই বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের গোয়েন্দা শাখা পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধি ও নানা কর্মকাণ্ডের সংবাদ মুক্তিবাহিনীকে সরবরাহ করত। গেরিলাদের মধ্যে ছাত্র ও কৃষকদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি।

মুজিবনগর সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে এগারটি সেক্টরে বিভক্ত করে এবং প্রতিটি সেক্টরের দায়িত্ব একেকজন কমাণ্ডারের হাতে ন্যস্ত করে। সেক্টর কমাণ্ডারদের অধীনে নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি অনিয়মিত গেরিলা যোদ্ধারা নিয়োজিত ছিল। উল্লেখ্য, দশ নম্বর সেক্টরের কোনো আঞ্চলিক সীমানা ছিল না। এটি গঠিত হয়েছিল নৌ-কমাণ্ডারদের নিয়ে। প্রচলিত কায়দায় যুদ্ধের পাশাপাশি গেরিলাযুদ্ধের রণকৌশল গ্রহণ করে মুক্তিবাহিনী হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। ক্রমাগত যুদ্ধে জনবিচ্ছিন্ন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ক্রমশ হীনবল ও হতাশ হয়ে পড়ে।

পাকিস্তানের সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে পাক-ভারত যুদ্ধ হিসেবে দেখানোর জন্য ভারতের ওপর বিমান আক্রমণ চালায়। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ৪ ডিসেম্বর ভারতের লোকসভা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারত সরকার ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। এসময়ে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতের নিয়মিত সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে একটি যৌথ কমান্ড গঠন করা হয়। এই যৌথ কমান্ড জলে, স্থলে ও আকাশপথে প্রবল আক্রমণ চালায়। ফলে মাত্র কয়েক দিনের যুদ্ধে পাকবাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও পরাজিত হয়।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হানাদার পাকবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজী ৯৩,০০০ (তিরানব্বই হাজার) পাকিস্তানি সৈন্য, বিপুল পরিমাণ রসদ ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ রেসকোর্স ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের মানচিত্রে রক্তের অক্ষরে লিখিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের নাম।

চিত্র : বিজয় অর্জনের পর মুক্তিসেনা ও সাধারণ মানুষের আনন্দ-উল্লাস

নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে ৩০ লক্ষ বাঙালি প্রাণ হারায় এবং ২ লক্ষ ৭৬ হাজার মা-বোনের সম্ভ্রমহানি ঘটে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়। ১ কোটি মানুষ দেশ ত্যাগ

করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই মুক্তি সংগ্রামে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পূর্ব মুহূর্তে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর এ দেশীয় দোসররা দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের অনেককে রায়ের বাজার ও মিরপুর বধ্যভূমিতে নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। অবিভক্ত পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পরও দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বিবেচিত পূর্ব বাংলার বাঙালিরা এবার স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ

বাংলাদেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দেশ। সে যুদ্ধ স্থায়ী হয় নয় মাস। অনেক রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা লাভ করি। স্বাধীনতার পর পর প্রণীত আমাদের দেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতির মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ অত্যন্ত সঠিকভাবে পরিব্যক্ত। নীতিগুলো হচ্ছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। গণতন্ত্রের জন্য বাঙালিরা দীর্ঘ সংগ্রাম করেছে। বাংলাদেশকে সত্যিকার একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা ছিল তাদের স্বপ্ন। সর্বপ্রকার শোষণ ও বৈষম্য থেকে মুক্তিলাভ ছিল তাদের অপর একটি লক্ষ্য ও আদর্শ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই বাঙালিরা শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার, অন্য কথায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র হবে সবার' –এ চেতনা-আদর্শ নিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলে ছিল স্বতন্ত্র জাতিসত্তার চেতনা, যাকে আমরা বলি বাঙালি জাতীয়তাবাদ। একটি স্বতন্ত্র জাতির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের আবশ্যক হয়। আর বাঙালি জাতিসত্তার মধ্যে আমাদের নিজস্ব ভূখণ্ড, ভাষা-সাহিত্য, অসাম্প্রদায়িক বা সহিষ্ণু সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যগত চেতনা নিহিত রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা মালিকানার মধ্যেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-আদর্শ ব্যক্ত। পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক সামরিক-বেসামরিক আমলা ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর একটি প্রতিষ্ঠান। আমাদের দেশের সর্বস্তরের জনগণ মুক্তিযুদ্ধ করেছে। রাষ্ট্রের মালিকও তারা সকলে। তাই আমাদের সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' (অনুচ্ছেদ ৭(১)। একটি সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলাই আজ আমাদের দায়িত্ব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' কে ঘোষণা করেন?

ক) এ. কে. ফজলুল হক
খ) মহাত্মা গান্ধী
গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

২। যুক্তফ্রন্ট নিচের কোন দাবি উত্থাপন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাঙালিদের আকৃষ্ট করেছিল?

ক) পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন করা

খ) প্রদেশগুলোর শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা দেয়া

গ) পূর্ব বাংলায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা

ঘ) সকল রাজবন্দীর মুক্তি দেওয়া

৩। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবার পেছনের কারণ হলো, মুসলীম লীগ-

i. বাঙালিদের আস্থাভাজন হতে পারেনি

ii. এদেশবাসীর সর্ব অধিকার কেড়ে নেয়

iii. উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' ব্যক্তি দীর্ঘ ২০ বছর ইউরোপের একটি দেশে থাকার পর নিজ গ্রাম রূপপুরে ফিরে আসেন। একদিন গ্রামের একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি মাঝে মাঝে উক্ত দেশের ভাষা বলতে থাকলে গ্রামের মানুষ তাকে দেশের ভাষা বলার জন্য অনুরোধ করেন।

৪। রূপপুর গ্রামের মানুষের জীবনে ইতিহাসের কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষণীয়?

ক) ভাষা খ) অসহযোগ

গ) ছয় দফা ঘ) এগার দফা

৫। উক্ত আন্দোলনের ফলে বাঙালির জীবনে প্রধানত–

ক) জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হয় খ) ধর্মীয় চিন্তা বৃদ্ধি পায়

গ) রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হয় ঘ) প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কখন পালিত হয়?

খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরের ছবিটি আমাদের কোন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছবির লোকগুলোর চেতনাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম দিতে সক্ষম হয়– উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

২। শিশির একটি কারখানায় চাকরি করত। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার কারখানার অনেকেই যুদ্ধে যোগদান করে। তাদের দেখাদেখি একদিন সে বাড়ি থেকে পালিয়ে একটি বাহিনীর অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকালে গুলির আঘাতে তার একটি পা হারায়। যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে সে তার চাকরি এবং পরিবার কিছুই ফিরে পায়নি।

ক. ছয় দফা কর্মসূচি কে উত্থাপন করেন?

খ. গেরিলা যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. শিশির মুক্তিযুদ্ধে কোন বাহিনীর সদস্য ছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শিশির ও তার সঙ্গীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান–মূল্যায়ন কর।